নব যুগের নব অবতার

ভগবান ব্রজানন্দ স্বামীর

লীলা পরিচয়

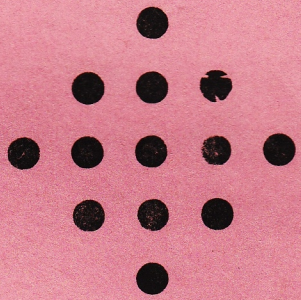

শ্রীমৎ গণপতি দেব
গুরুধাম
কলিকাতা-৫৫

প্রকাশক—গুরুধাম,
কলিকাতা।

১ম সংস্করণ—১৩৩৮
২য় সংস্করণ—১৩৬৯
৩য় সংস্করণ—১৩৭৬
৪র্থ সংস্করণ—১৩৮০
৫ম সংস্করণ—১৩৮৪
৬ষ্ঠ সংস্করণ—১৩৯০

মূল্য—দুই টাকা

মুদ্রণে ঃ
জলি আর্ট প্রেস
৭/১এ, জাষ্টিস মন্মথ মুখার্জী রো,
কলিকাতা-৭০০০০৯

শিবোঽহম্ শিবোঽহম্ শিবোঽহম্

শ্রীশ্রীস্বামী ব্রজানন্দ

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ

লীলা পরিচয়

প্রথম খণ্ড

—:০:—

১। অথ ধ্যানম্

সত্যং শিবং জ্ঞানমনন্ত মেকং
পাতকী নামুদ্ধারায় অবতীর্ণং যেন
শ্যামলপীত কলেবরং সিদ্ধাসনং
আনন্দরূপং ব্রজানন্দং নমামি।

———

২। আবাহন (ভজন)

ও জগতবাসী আয়রে ছুটিয়া আয়
নাচিয়া নাচিয়া মোর ব্রজরাজ
ব্রজানন্দ ঐ প্রেম বিলায়।
কে আছ ব্যথিত আকুলিত চিত,
কে আছ সংসার দাব দাহ ভীত,
লহরে শরণ কলুষ-হরণ
ব্রজসুন্দর-পায়।
কে আছ হৃদয়ে মরুভূমি লয়ে,
দুখে ভরা বুক শোকে ভরা হিয়ে,
চাহিয়ে দেখরে তোমাদেরি তরে
নবরূপে ঐ মোর ব্রজরায়।
কি ভাবনা আর এসেছে এবার
দাতা শিরোমণি করুণা আধার
(ঐ দেখ) পাপী তাপী যত পামর পতিত
সবাই তরিয়া যায়।
মোহ পরিহরি এস নর নারী,
দুই বাহু তুলি বলে হরি হরি,
দেখ তোমাদেরি তরে কাঙ্গাল হয়েছে
ঐ যে রে ঐ, মোর ব্রজরায়।

———

৩। অবতরণিকা

জানি, যে কার্য্যে আমি অগ্রসর হয়েছি আমি তার সম্পূর্ণ অযোগ্য। অনন্ত লীলা রসময় ভগবানের লীলার কথা বর্ণনা করতে যাওয়া আমার মত ভক্তিহীন ব্যক্তির পক্ষে বাস্তবিকই নিতান্ত দুঃসাহসিক ধৃষ্টতা।

মহামহা পণ্ডিত ভক্তগণও যে কার্য্যে অগ্রসর হতে ইতস্ততঃ করেন, অগ্রসর হয়েও যাহা সুসম্পন্ন করতে পারেন না, ভক্তিহীন মূঢ় আমি কেন সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেছি নিজেই তাঁর উত্তর খুঁজে পাই না। চৈতন্য চরিতামৃত লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজের কথা মনে পড়ে। তিনি চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থখানি একদিন সকালবেলা লেখা শেষ ক'রে অত্যন্ত আনন্দিত মনে গঙ্গায় স্নান করতে চল্‌লেন। মনে মনে তাঁর বেশ অহঙ্কার হ'ল—ভগবান গৌরাঙ্গদেবের সম্পূর্ণ লীলার কথাটি আমি লিখে শেষ করেছি—কিছু আর বাকী নাই। অহং চূর্ণ দীন বন্ধু ভগবান ত অন্তর্যামী,—অন্তরীক্ষ থেকে সে দিন কৃষ্ণদাস কবিরাজের অহঙ্কার দেখে মনে মনে হাসছিলেন। স্নানের ঘাটে বসেই কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর অহঙ্কারের জবাব পেলেন। তিনি গঙ্গার কূলে গিয়ে দেখেন—এক চড়াই পাখী একবার গঙ্গার জলে ডুব দিচ্ছে আর বার ফিরে এসে তীরে বালুকার মধ্যে গড়াগড়ি দিচ্ছে। চড়াই পাখীটাকে বার বার এইরূপ করতে দেখে কৃষ্ণদাস কবিরাজের বড্ড কৌতূহল হ'ল। তিনি তখন পাখীটাকে সম্বোধন ক'রে জিজ্ঞেস করলেন, "পাখী, এ তুমি করছ কি?" পাখী উত্তর দিলে, "কবিরাজ, মনে ক'রেছি গঙ্গানদীতে আমি একটা বালির বাঁধ দেব। তাই, তীরে এসে গড়াগড়ি দিয়ে পাখায় বালি লাগিয়ে জলে ডুব দিয়ে ঝেড়ে ফেলছি।" কৃষ্ণদাস কবিরাজ উচ্চ হাসি হেসে বল্‌লেন, "পাখী, তুমি

কি বাতুল হয়েছ? লক্ষ কোটি বৎসর চেষ্টা করলেও কি তুমি এই ভাবে এমন বিশাল নদীতে বাঁধ দিতে পার?" পাখী আরো জোরে হাসি হেসে জবাব দিলে, "কবিরাজ, তুমি ত দেখি তাহ'লে আমার চেয়েও বাতুল; এই সামান্য নদীর বুকে একটা বাঁধ বাঁধতে যদি আমি না পারি, তাহলে তুমি কি করে ভেবছ যে অনন্তলীলা রসময় ভগবানের অনন্তলীলার কাহিনী তুমি লিখে শেষ করেছ?" গল্পটি কাব্যই হোক্ আর যাহাই হউক, কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইহাদ্বারা এই সত্যকে বুঝাতে চান যে, অনন্ত বিভূতিসম্পন্ন যিনি বিশ্বরূপ বিশ্বম্ভর, তাঁহার লীলার কথা কেউ বর্ণনা করে শেষ করতে পারে না। মহাপুরুষ মহম্মদ বলেছেন, "অনন্ত আকাশ যদি পত্র হয়, অনন্তসিন্ধু যদি মসী রাশী হয়, অনন্ত স্বর্গবাসীগণ যদি লেখক হন এবং অনন্ত কাল ধরে যদি লেখনী চালনা করা যায় তথাপিও সেই অনন্তের কণামাত্র গুণকীর্ত্তন করা যায় না।"

আমি আজ যে যুগাবতার মহাপুরুষ ব্রজানন্দ স্বামীজীর কথা আপনাদিগকে বলতে যাচ্ছি তিনি বর্তমান যুগের অবতার পুরুষ; তাঁহার অপূর্ব লীলা মাহাত্ম্য আমার মত দীনজনের দ্বারা বর্ণিত হওয়া সম্ভব নয়। তবু জানি—আমি দীন হীন পাষণ্ড হতে পারি, কিন্তু যাঁর কথা আমি লিখতে যাচ্ছি তিনি যে অনন্ত গুণের আধার। তাই ভরসা হয় আমার বলায় অসংখ্য দোষ থাকলেও বক্তব্য বিষয়ের অনন্ত গুণরাশির মধ্যে সে দোষ নিশ্চিহ্নরূপে নিমগ্ন হ'য়ে যাবে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুই ত নিজমুখে নিজগুরু ঈশ্বরপুরীকে বলেছিলেন -

"—ভক্ত বাক্য কৃষ্ণের বর্ণন।
ইহাতে যে দোষ, দেখে সেই পাপীজন"
ভক্তের কবিত্ব যে-তে-মতে কেনে নয়।

সর্ব্বদা কৃষ্ণের প্রীতি জানিহ নিশ্চয়
মূর্খ বোলে 'বিষ্ণায়" বিষ্ণবে বোলে—ধীর
দুই বাক্য পরিগ্রহ করে কৃষ্ণ বীর ॥
ইহাতে যে দোষ দেখে তাহাতে সে দোষ
ভক্তের বর্ণন মাত্র কৃষ্ণের সন্তোষ।

ভক্তজনে আমার কথার দোষ ধরবে না জানি, কিন্তু তবুও ত ভয় হয় অল্প শক্তি ভক্তিহীন দুরাচার আমি অনন্ত দেবের অনন্ত লীলার কথা লিখতে গিয়ে তাঁর ছবি আমার ঢঙে এঁকে তাঁকে পাছে ছোট ক'রে ফেলি। সে ত করব নিশ্চয়ই, তবু কেন জানি না আমাকেই ভগবান ব্রজানন্দ স্বামী একদিন স্বপ্নযোগে এই কার্যের ভার দিলেন। সেই কথাটাই ভূমিকার মধ্যে পাঠকবর্গকে আমার এ গুরু দায়িত্বের অসংখ্য দোষের কৈফিয়ৎ স্বরূপ শুনিয়ে দিয়ে মুক্ত হ'তে চাই।

অনন্ত করুণাময়ের করুণা কখন যে কিভাবে কাকে অভিসিঞ্চিত করে তা বুঝবার উপায় নেই। অহৈতুকী তাঁর দয়া—যে দয়া কোন ধারা বেয়ে আসে না কোন সাধনেরও অপেক্ষা রাখে না।

"আমি যে তোমারে চাহিনি নাথ,
তুমিই আমারে চেয়েছ ;
চির আদরের বিনিময়ে সখা,
চির অবহেলা পেয়েছ।"

সাধক হয়ত আমার কথ বিশ্বাস করতে পারবেন না—তিনি হয়ত বলবেন—সাধন ছাড়া কি সাধনের ধনকে লাভ করা যায়? কিন্তু সাধন ভক্তিহীন আমি জানি - সে কথা কত বড় অসত্য। চিরকাল ভগবানের নাম শুনেও, ভক্ত ও ভগবানকে উপহাস করেছি। তবু সে অনন্ত করুণা পারাবার আমার সে চির অবহেলার বিনিময়ে কত

না আদর অবাধ্য আমারি পাছে পাছে ছুটে গিয়ে কাছে টেনে এনেছেন। স্বামীজীর কাছে কাছেই ত বহুদিন যাবৎ বাস করছি, তবু ত কোন দিন তাঁর কাছে আসা প্রয়োজন বোধ করিনি। বরং ভেবেছি—তাঁর কাছে আমার শিখবার কি থাকতে পারে; আলখেল্ল পরা একজন ভক্তের কাছে যাবার আমার কিই দরকার? এত বড় আত্মপ্রবঞ্চক পাষণ্ড আমি, এমন পর্ব্বতপ্রমাণ ছিল আমার অহঙ্কার। তখন কে জানত— আমার সে অহঙ্কারের হিমালয় গিরি একদিন চোখের জলের আকুল বন্যায় ডুবে যাবে। সেদিন পূর্ণিম রাত্রি। উঃ! সে কি মাতাল করা চাঁদনী রাত, আকুল করা ফুলের ঘ্রাণ, উদাস করা দক্ষিণ হওয়া। রাত্রি তিনটার সময় একবার বিছানা ছেড়ে উঠে কিছুক্ষণ পায়চারি ক'রে আবার গিয়ে শুয়ে পড়লুম। তন্দ্রাভিভূত হয়ে দেখতে ছিলাম—কোন্ যে দুর্গম বনের মধ্যে এক গাছের তলে দাঁড়িয়ে আছি। আমার অনতিদূর দিয়ে বনের মধ্যেই একখানি পথ। দেখি —সেই পথ দিয়ে একাকী হেঁটে চলেছেন স্বামিজী। স্বামিজীকে আগেও আমি দুই একবার দেখেছি, তাই চেহারাটা চিনতাম, কিন্তু কখনও আলাপ করিনি। স্বপ্নের মধ্যেও আগেকার মত উপেক্ষার ভাবে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। আমাকে ছাড়িয়ে কিছুদূর চ'লে গেলেন, সহসা থেমে এ হতভাগাকে তিনি আহ্বান করলেন, "ওহে, তুমি এদিকে এসত।" সে কি করুণা ভরা মধুর স্বর! কিন্তু চির অহঙ্কারী এ আমার পাষাণ হিয়া তবুও গল্‌ল না! আমি দম্ভপূর্ণ স্বরে উত্তর দিলাম "কেন, আমাকে দিয়ে আপনার প্রয়োজন?" "হাঁ প্রয়োজন আছে, তুমি এসে দেখ না একবার।" এ কি! পর মুহূর্ত্তেই চেয়ে দেখি —স্বামিজী যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানে ভুবনমনোমোহন অপূর্ব যুগল মূরতি—শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকা। ছবির দোকানে যে যুগল মূর্ত্তির

ছবি দেখি এ যে তাই। শিখি পাখা চূড়া, গলে বনমালা, হাতেতে মোহন মুরলী, বামেতে শ্রীমতি রাধা-বিনোদিনী। সে মূর্ত্তি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম সত্য, কিন্তু তখনও ত আমার অহঙ্কার দূর হয়নি। কাছে গিয়ে আমি পূর্বের মতই স্পর্ধিত স্বরে উত্তর দিলাম, "কেন আপনি আমায় ডাকুছেন?" তিনি মৃদু হেসে উত্তর দিলেন—"তুমি এস আমার সঙ্গে—তুমি যা চাও আমি তাই দেব।" আমি আবার প্রশ্ন করলাম, "আপনার কাছে আমি কি চাইব, কিই বা দিতে পারেন আপনি আমাকে?" তিনি বললেন, "কি আমি তোমাকে দিতে পারি,—সে কথা তোমার জেনে কাজ নেই, তবে এই জেনো—যদি তুমি প্রাণ চাও, আমি তাও দেব।" তাঁর সে মধু হতে মধুর প্রেমে-মাখা স্বরে নিজের অজ্ঞাতসারেই তখন যেন বিস্ময় বিমুগ্ধ আত্মবিস্মৃত হয়েছি—শুধু অস্ফুট স্বরে বল্‌লাম, "কেন দেবেন।" তিনি তখন ভুবন ভুলান মৃদু মধুর হাসি হেসে আমার হাত ধরে বললেন—"তুমি যে আমার ভক্ত, ভক্ত আমার মাতাপিতা,—ভক্ত আমার বন্ধুভ্রাতা—ভক্ত যে আমার প্রাণ। এবার যে আমি শুধু ভক্তের জন্য ব্রজানন্দ স্বামীরূপে অবতীর্ণ হয়েছি। কৃষ্ণ অবতারে যখন অবতীর্ণ হই তখন শুধু শ্রীমতির সাথে প্রেমলীলা করবার জন্যই আমার সে অবতার। কিন্তু সে অবতারেও রাধার সঙ্গে প্রেমলীলা সাঙ্গ করতে পারি নাই—শ্রীমতির কাছে ঋণী থেকে যাই। তাই পুনরায় রাধার প্রেমের ঋণ-পরিশোধ করার জন্য রাধা প্রেমে বিরহোন্মাদ গৌরাঙ্গ-রূপে অবতীর্ণ হই। কিন্তু এর একবারও জীবের কল্যাণের জন্য বিশেষ কিছু ক'রে যেতে পারি নি। আমার নাম ভক্তবাঞ্ছা কল্পদ্রুম হরি—সে বারেও ভক্তের প্রাণের পিয়াসা মিটিয়ে যেতে পারলাম না। তাই যখন লীলার সময় ফুরিয়ে এল, তখন একদিন ভক্তবৃন্দ সঙ্গে নিয়ে

শ্রীক্ষেত্রধামে হরিসংকীর্ত্তনে মাতোয়ারা হ'য়ে সহসা জগন্নাথদেবের শরীরের সঙ্গে মিলিয়ে যাই। ভক্তের প্রাণবল্লভ আমি আমাকে হারিয়ে ভক্তগণের সেদিন যে কি ব্যাগ্র ব্যাকুল আকুলতা। আমি তখন পুনরায় আবির্ভূত হ'য়ে ভক্তগণকে এই আশ্বাস দিয়ে গিয়েছিলেম—"ভক্তগণ, তোমরা উতলা হ'য়ো না, তোমাদের প্রাণের পিপাসা আমি এবারও মিটিয়ে যেতে পারলাম না,—তাই আমি অঙ্গীকার করে যাচ্ছি—আমি পুনরায় অবতীর্ণ হব। শ্রীক্ষেত্র হ'তে ঈশান কোণে অবতীর্ণ হ'য়ে তোমাদের হৃদয়ের ক্ষুধা মেটাব। অন্য অন্য বারের মত রাধাকে ছেড়ে পৃথক পৃথক দেহ ধারণ ক'রে নয়—রাধা ও আমি এক দেহে এক সঙ্গে অবতীর্ণ হব। 'তখন আমার বর্ণ হবে কৃষ্ণ অবতারে মত কৃষ্ণ নয়—গৌরাঙ্গ অবতারের মত গৌরও নয়;—রাধার পীত বর্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তির কৃষ্ণ বর্ণ এই দুই বর্ণের সম্মিলনে শ্যামল-পীত।" এবার চেয়ে দেখি—যেখানে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি দাঁড়ান দেখেছিলাম—সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন—প্রেমগম্ভীর ধীর স্থির শান্ত সৌম্যমূর্ত্তি ব্রজানন্দ স্বামী। তিনি আবার বলতে লাগলেন—"বৎস, এবার আমি শুধু ভক্তের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছি—ভক্ত যদি আমার প্রাণ চায় আমি তাও দেব। গৌরাঙ্গ অবতারে যে "অনর্পিতং চরিং চিরাৎ"। প্রেমরস দেব ব'লে প্রতিশ্রুত হ'য়েছিলাম, সে রস ত তখন তাহাদিগকে দিতে পারিনি, এবার তাই দিতে এসেছি।" তুমি ত সেই বাঞ্ছা করেছিলে এস, এবার সেই রস নিজে পেয়ে জগৎকে বিলাও।" আমার তখন বাক্‌রোধ হয়েছে—চোখের জলের মধ্যে শুধু বলেছিলাম—"প্রভু গো আমি যে এর অযোগ্য।" স্বামিজী হেসে উঠলেন। স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। জেগে দেখি, চোখের জলে বালিশ ভিজেছে। তরুণ অরুণ তখন পূর্বাকাশ

রাঙ্গিয়ে তুলেছে। সমস্ত দেহমনপ্রাণে সেদিন সে প্রভাতে সে কি আমার অপূর্ব অকারণ পুলক বন্যা চোখের জলে উৎসারিত হ'য়ে পড়ছিল। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে ছুটে এলাম স্বামিজীর কাছে; পূর্বে কোন দিন তাঁর সঙ্গে পরিচয় ছিল না—তবু যেন চির পরিচিতের মত প্রেম তরল কণ্ঠে আমাকে আহ্বান করলেন তিনি। আমি কিছু বলবার পূর্বেই তিনি মৃদু হেসে প্রশ্ন করলেন, "কিরে; তোর মধ্যে আমার কেমন লীলা আরম্ভ হয়েছে—কিছু বুঝতে পারলি?" আমার আর সন্দেহ রইল না; আমি বুঝতে পারলাম স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন নয়—এ যে জাগ্রত সত্য। কিছুদিন পরে স্বামিজী আদেশ করলেন, "যা নবযুগের নূতন লীলার কথা সকলকে শুনা।" তখন কথাটাকে বেশী গ্রাহ্য করিনি, শুধু বলেছিলাম, "আমি কি পারব? আমার শক্তি কৈ?" স্বামিজী যদিও আদেশ করেছিলেন, তবু সেদিন ভাবিনি—সত্যিই এ লীলার কথা আমাকেই লিখে প্রথম সকলকে শুনাতে হবে। আরও কিছুদিন পরে আবার স্বপ্ন দেখলাম—যেন গঙ্গাস্নান করতে গেছি—প্রথম ডুব দিয়ে কেবল মাথা তুলেছি—অমনি দেখি—গঙ্গার মধ্যে অর্ধোত্থিতা মকর-বাহিনী গঙ্গা—হাতে তাঁর এক খণ্ড তালপাতার পুঁথি—তিনি পুঁথিখানি আমার হাতে দিয়ে বললেন—"বই লিখতে শক্তির কথা বলছিলে—এই লও পুঁথি—নূতন যুগের যুগাবতার ব্রজানন্দের লীলার কথা জগৎ-বাসীকে শুনাও।" বুঝলাম এ আদেশ আর অমান্য করা চলে না। তাই ত এই অতি দুরূহ কার্য্যের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি—

ক্ষুদ্র শক্তি ভক্তিহীন দীন কাঙ্গাল আমি—হায় ভগবান, কেমন ক'রে তোমার এ আদেশ আমি পালন করব। তবুও জানি তুমি পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করাও, মুককে বাচাল করো—তোমারই শ্রীচরণ শুধু ভরসা। দীন ভক্তের বন্দনা গ্রহণ করো।

মূকং করোতি বাচালম্ পঙ্গুংজঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহম্ বন্দে পরমানন্দ মাধবম্।

—ঃ:—

৪। লীলা পরিচয়

ব্রজ আনন্দ ব্রজানন্দ হে
তুমি প্রেম পারাবার
যুগে যুগে তব চলিয়াছে লীলা
কতরূপে কতবার।
দ্বাপরেতে তুমি ছাড়িয়া গোলোক
রাধারে লইয়া আসিলে ভূলোক,
গোলোকের মহাপ্রেমেতে জগৎ
করেছিলে মাতোয়ার।

প্রেমেতে সেবার ঋণী হয়ে হরি
দাসখৎ লিখে রাধা পদ ধরি
আরো তিন বার লীলা করিবার
করিলে অঙ্গীকার।
হলে নদীয়ায় তাই ত নিমাই
'রাধা রাধা' ছাড়া আর বুলি নাই,
রাধার বিরহে দেহ মন দহে
নয়নে বহিত ধার।

সে লীলা যখন হয় সমাপন
ভক্ত সঙ্গে করো কীর্ত্তন ;
শ্রীক্ষেত্রে শ্রীমন্দির তলে
প্রেমের নাহিক পার ;
চিরদিন তব লুকোচুরি লীলা
জগন্নাথের দেহেতে মিশিলা ;
ভক্তরা কান্দে কোথা হরি গেলা
চারিধারে হাহাকার।

ভক্তগণের হাহাকার শুনি
দিলে বাহিরিয়ে আশ্বাস বাণী—
শ্রীক্ষেত্র হ'তে ঈশান কোণেতে
পুনরায় অবতার।

রাধিকার ঋণ পরিশোধ তরে
এবারের লীলা যাই শেষ করে ;
ভক্তের তরে এবারো নারিনু
কোন কিছু করিবার।

(আমি) ভকত অধীন ভক্তের দাস
মিটাতে নারিনু ভক্তের আশ,
তাইত শুধুই ভক্তের লাগি
হব পুনঃ অবতার।

ঈশান কোণেতে "বুড়াশিব" ধাম
চির পরিচিত পবিত্র নাম ;
তাইত এবার হে করুণাধার,
হেথা তব অবতার।

গোলোক ছাড়িয়া ওহে রাজ রাজ,
ভক্তের লাগি ভিখারীর সাজ,
লয়েছ তুলিয়া করুণা সাগর,
ব্রজানন্দ আমার॥

—:০:—

৫। অবতার বাদ

যখনই জগতে উদ্ধত অন্যায় ন্যায়ের বক্ষে চেপে বসেছে স্ফীতকায় ক্ষুধাতুর লোভ দুর্বল দারিদ্র্যের সর্বস্ব অপহরণ করবার জন্য মুখ ব্যাদান করেছে, গর্ব্বিত অবিচার মূক মৌন বেদনাকে পদদলিত ক'রে চলেছে, তখনই শক্র নিসুদন দীনবন্ধু মধুসূদন অবতীর্ণ হ'য়ে, কংস বা রাবণকে বধ করে পৃথিবীকে পাপভার মুক্ত করেছেন।

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

করুণাময় ভগবান শ্রীমুখ নিঃসৃত অমিয় মধুর আশ্বাসের বাণী। যুগে যুগে ভগবান অধর্মের বিনাশ ও ধর্মের সংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ

হয়েছেন!—এ শুধু ভারতবর্ষের নয় সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস এর জ্বলন্ত প্রমাণ। জুদিয়া দেশের কথা আলোচনা করলে জানা যায়, সে দেশে কিরূপ ঘোরতর জাতি বৈষম্য ছিল। ইহুদীগণ মনে করত তারাই শুধু ঈশ্বরের বরপুত্র—অন্যান্য সকলেই তাদের দাসত্ব করবার জন্য সৃষ্ট। কোন ইহুদী পথে চলতে থাকলে সমরীয় দেশের কোন লোকের আর সে পথে চলবার অধিকার ছিল না। সে দিন এই অসাম্য ও ইহুদীদের মন্দিরে মন্দিরে আরও যে সকল অন্যায় অবিচার চলছিল—সে সমস্ত দেখে স্বর্গধামে বিধাতার সিংহাসন কেঁপে উঠল—তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না, দয়াল যীশুখ্রীষ্টরূপে অবতীর্ণ হ'লেন পৃথিবীতে। অযুত আর্ত্ত মানবের নয়নের জল মুছিয়ে দিলেন তিনি তাঁর অনন্ত স্নেহের অঞ্চল প্রান্তে। একই ভগবানের সৃষ্ট মানুষ মাত্রই সমান—পরস্পরের ভাই—এই মহা সাম্যের বাণী প্রচার করিলেন তিনি। কয়েক শত বৎসর পরে ইহুদীদের এই অন্যায় অত্যাচারের পুনঃ প্রবর্তন হ'ল আরবে, তাই সেদিনও মহাপুরুষ মহম্মদরূপে ভগবান জগতে অবতীর্ণ হ'লেন। আমাদের দেশের ইতিহাসও এই একই কথা প্রমাণিত করে। বহু অতীত যুগে এ দেশের সনাতন ধর্মও যখন বিকৃত আচার পদ্ধতি ও ক্রিয়া-কাণ্ডের চাপে লুপ্ত হচ্ছিল। যাগ-যজ্ঞ, অসংখ্য পশুবলিতে এদেশের গঙ্গা ভাগীরথী পর্যন্ত সেদিন রক্তবর্ণ হয়ে উঠছিল—সেদিনও সেই সব অযুত আর্ত্ত মৌন ব্যথিতের হাহারবে স্বর্গধামে বিধাতার সিংহাসন টলে উঠ্‌ল - তিনি দয়ার অবতার বুদ্ধদেব-রূপে অবতীর্ণ হ'লেন পৃথিবীতে। ভারত ভরা লক্ষ লক্ষ বেদনাতুর মানবের দুঃখ, দৈন্য, দারিদ্র্য দেখে রাজপুত্র বুদ্ধ সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী হ'লেন। তিনি ঘোষণা করলেন—মিথ্যা এই জীব রক্তে কলঙ্কিত যাগযজ্ঞ। অহিংসা পরমঃ ধর্মঃ।

নব প্রচারিত এই প্রেম ধর্মের বিজয় পতাকা তলে সেদিন লক্ষ লক্ষ দিশেহারা জগৎবাসী তাদের মহানির্বাণের পথ খুঁজে পেয়েছিল। তারপর কালপ্রভাবে আবার বুদ্ধ নির্দেশিত এই নব আদর্শ হতেও ভারতবাসী ভ্রষ্ট হ'য়ে দিক্‌ভ্রান্ত হ'য়ে উঠ্‌ছিল—পতিতপাবন ভগবান তখন নানারূপে অবতীর্ণ হয়ে পুণ্য আদর্শে ভারতবর্ষকে উদ্বোধিত করেছেন। রাম, কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ, নানক, কবীর, রামমোহন র'য় প্রভৃতি অবতারের কথা আমরা সকলেই জানি। চারিশত বৎসর পূর্বে এদেশে যখন বামাচার, মদ, গাঁজা প্রভৃতি দ্বারা ধর্মের নামে ব্যাভিচারের স্রোতে আকাশ-বাতাস কলুষিত হ'য়ে উঠল, তখন মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব নদীয়ায় অবতীর্ণ হ'য়ে নূতন আদর্শে ভারতকে পুনরায় উদ্বোধিত করলেন।

তিনি বললেন, "ওগো ভ্রান্ত মানব, জীবে প্রেম, নামে রুচি—ইহাই তোমার সত্য ধর্ম—হরের্ণাম, হরের্ণাম, হরের্ণামৈব কেবলম্—হরিনামেই তোমার একমাত্র গতিমুক্তি।"

প্রেমপাগল গৌরাঙ্গ ভারতের পল্লীতে পল্লীতে হরিনাম গানে মাতোয়ারা হলেন। সে প্রেমের বন্যায় সমস্ত দেশ প্লাবিত হয়ে গেল। যুগযুগান্তরের প্রেম পিপাসিত মানবগণ সে প্রেম জলধি হতে গণ্ডূষ ভ'রে আকণ্ঠ সুধাপানে বিভোর হ'য়ে উঠল। দ্বিজ ছাড়া আর কারো শাস্ত্র ধর্মে অধিকার নাই, রঘুনন্দনের এই মিথ্যা স্মৃতি ও অন্যান্য হাজার রকমের মিথ্যা আচারের অত্যাচার অনুশাসনের শৃঙ্খল হ'তে দেশ মুক্তি পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। ক্রমে ক্রমে আবার নানা দিক দিয়ে গলদ ঢুকে হিন্দুর ধর্ম-জীবনের কণ্ঠ চেপে ধরল।

দেড়শত বৎসর পূর্বে যখন ইংরাজগণ পশ্চিম হতে নানা নূতন রকমের বিলাসিতার মোহ ও আকর্ষণ নিয়ে এ দেশে ক্রমে হাজির

হ'ল, সেদিন ভারতবাসী মুগ্ধবিস্ময়ে আত্মবিস্মৃত হয়ে পশ্চিমের বিলাতি কুকুর থেকে আরম্ভ করে বিলাতি মেম পর্যন্ত পরম রমণীয় আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী মনে করতে লাগল। দলে দলে ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দুগণ পশ্চিমদেশী খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতো। মহাত্মা রামমোহন রায় নানা জোড়াতালি দিয়ে এক ধর্ম সৃষ্টি করে, সেদিন সনাতন ধর্মকে রক্ষা করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি যে সনাতন ধর্মের নিজস্ব সত্যটিকে চেপে রেখে খৃষ্ট ধর্মের সঙ্গে রফা করতে গেলেন। এতেই বুঝি তাঁর সে মহতী চেষ্টা সম্পূর্ণ সার্থক ও ফলবতী হ'তে পারল না তাই বর্তমানে আবার ভগবানের অবতারের প্রয়োজন হয়েছে।

"গীতায়" সেই "সম্ভবামি যুগে যুগে" এই উক্তি যদি অবিশ্বাস না করা চলে, তবে যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই ভারতে বর্তমান অবস্থার কথা চিন্তা করলে সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারবেন—ভগবান যদি পতিত পাবন হন, তবে ত রাষ্ট্রে পরাধীন, সমাজে বিচ্ছিন্ন, ধর্মে উচ্ছৃঙ্খল, অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত দেশে আজ আর তিনি অবতীর্ণ না হ'য়ে পারেন না। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা গরীয়সী ভারতভূমি আজ দীনহীনা পথের কাঙ্গালিনী। সে ভুলেছে তার অতীত দিনের গৌরবের কথা, সে ভুলেছে তার বেদ বেদান্ত দর্শন শাস্ত্র, সে ভুলেছে তার সনাতন ধর্ম, তার আর্য ঋষি, তার ভগবান, তার রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, গৌরাঙ্গের কথা। সে আজ সকল রকমের আত্মবিস্মৃতা। তার এই মোহকারী আত্মবিস্মৃতি বিধ্বংস ক'রে অতীত গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই আজ ভগবান্ ব্রজানন্দ স্বামী অবতীর্ণ হ'য়ে 'শিবোহম্' মন্ত্র বিতরণ করছেন।

—:০:—

৬। ব্রজানন্দ রূপ বর্ণনা

বল ব্রজরাজ সন্ন্যাসীর সাজ
তোমায় কে দিল পরায়ে।
শিখী পাখা চূড়া কোথা পীত ধরা
কেন গো রাখিলে লুকায়ে॥
ফেলিয়ে বাঁশরী গৈরিক পরি
দীন সন্ন্যাসী কেন হলে হরি?
প্রেমেতে বিভোল মুখে হরি বোল
নাচিছ সবারে নাচায়ে॥
বাঁশরী ছাড়িয়া ধরেছ দণ্ড
গৈরিক করেছ পীতবাস খণ্ড
চন্দন চর্চিত শ্রীঅঙ্গ শোভিত
বিভূতিভূষণ মাখায়ে।
শ্যামের সহিতে গৌরাঙ্গ মিলে,
পূর্ণ রূপেতে পৃথিবীতে এলে,
শ্যামের শ্যামল বর্ণের পরে
গোরার গৌররঙ্ মাখায়ে।
এবার হে হরি নও তো হে শুধু
রাধার প্রেমেতে নাগরলি বঁধূ
ভক্তের লাগি হয়েছে বিরাগী
রাধা দেহে দেহ মিলায়ে।
যুগে যুগে তুমি কত রূপ ধরি
জীয়াইলে জীবে হেথা অবতরি
আমি যে হে হরি, রয়েছি মরিয়ে
আমারে দাও গো বাঁচায়ে॥

৭। নব যুগের নব অবতার
ব্রজানন্দ স্বামীর বাণী

নব যুগের নব অবতার ভগবান ব্রজানন্দ স্বামীর বাণী মাত্র একটি কথায় বলা যেতে পারে, যে বাণী তিনি দিবানিশি সর্বদা সদা উচ্চারণ করেছেন "শিবোহম্"। এ বাণী ভারতের নিজস্ব অতি অন্তরের বাণী। এই বাণীই সংক্ষেপতঃ ভারতের উপনিষদ্, ভারতের বেদান্ত, ভারতের দর্শন শাস্ত্র। ভারতবাসী আজ এই মহাকাব্য ভুলেছে না বলেই তার যত দুঃখ, দৈন্য, দারিদ্র্য ও দুর্গতি। ব্রজানন্দ স্বামী তাই আজ এই আত্মবিস্মৃত জাতির দুয়ারে দুয়ারে করাঘাত করে জলদ গম্ভীর নিনাদে ঘোষণা করেছেন, "ওগো ভারতবাসী, আত্মানম্ বিদ্ধি।" ভাব একবার তুমি কে? দুঃখ, দৈন্য, দারিদ্র্য, প্রপীড়িত, মূঢ় জীব! মিছেই তুমি যশ, মান, অর্থের কাঙ্গাল হ'য়ে ভিক্ষুকের মত দ্বারে দ্বারে ফিরছ, একবার ফিরে চেয়ে দেখ তোমার নিজ অন্তরের ঐ অন্তর মহলে—আত্মার মণিকোঠায়; চেয়ে দেখ, কত অগণিত ধনভাণ্ডার সঞ্চিত রয়েছে সেথায়। তবে কেন তোমার এ দীনহীন কাঙ্গালের বেশ? ধন, জন, মান, প্রতিপত্তি কামনা করছ কেন? কিসের জন্য? সুখের জন্যই ত? কিন্তু সুখ শান্তি সে ত বাইরের নয়। শান্তি অন্তরে, শন্তি আত্মায়। শান্তি আত্মারাম শ্রীভগবানে। শ্রুতি বলেন, 'প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয় পুত্রাৎ প্রেয়োহন্যাস্মাৎ সর্বাস্মাৎ অন্তরতরং যদয়ং আত্মা" আত্মা ধন হ'তে প্রিয়, পুত্র হ'তে প্রিয়, অন্য সমস্ত প্রিয় হতেই প্রিয়তর এবং সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম। অতএব আত্মাতেই সমস্ত সুখ কেন্দ্রীভূত। আগে জানো কি সেই আত্মা,

তোমার নিজস্ব রূপ, নিজ আত্মাকেই তুমি জানো না ; তাই ত তোমার যত দুঃখ, যত দৈন্য, যত তোমার হা-হুতাশ। জরা, মরণ, ব্যাধি, দুঃখ, দৈন্য হাহুতাশের এই যে সমস্যা—ইহা মানব জাতির চিরন্তন সমস্যা। এই সমস্যায় জর্জরিত হ'য়ে মানব জাতি চিরকাল মুক্তির প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছে। এই প্রশ্নের সমাধানকল্পেই ভগবান বার বার মানবদেহ ধারণ ক'রে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে রাজপুত্র বুদ্ধ জীর্ণ কন্থা পরিধান করে সংসার বিরাগী সন্ন্যাসী হয়েছেন।

বর্তমানে অধর্মের মধ্যে দিশেহারা আত্মবিস্মৃত মানব জাতির সত্যিকারের আত্মজিজ্ঞাসাও এই প্রশ্ন। এই জিজ্ঞাসার উত্তর নির্দেশ করবার জন্যই আজ ভগবান ব্রজানন্দ স্বামী মানবের দ্বারে দীন সন্ন্যাসীর বেশে উপস্থিত হয়েছেন। ঐ শোন মোহ-মুগ্ধ মানব, তোমারি তরে নগ্ন সন্ন্যাসীর বেশে করুণাময় ভগবান ব্যগ্র ব্যাকুল কণ্ঠে ডেকে তোমাকে বলছেন, 'ওগো পাশবদ্ধ জীব আত্মবিস্মৃত বিমূঢ় হ'য়ে রয়েছ কেন—তুমি যে শিব ; একবার আত্মচৈতন্য লাভ করে পাশ মুক্ত হও। "নির্গতোঽসি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী।" প্রবল পরাক্রম সিংহ তুমি, সামান্য বংশ পিঞ্জরে আবদ্ধ হয়ে ঘুমিয়ে রয়েছ। অমিত তেজ সিংহশাবক হয়ে তুমি ভেড়ার দলে মিশে ভেড়া ব'নে গেছ। নিজের চেহারার দিকে একবার দৃক্‌পাত করো। মায়ামোহের অধীনতা পাশে আবদ্ধ হ'য়ে আছ বলেই তুমি জীবত্বের দাসত্ব করছ। এই মায়া-মোহের অধীনতা পাশ ছিন্ন করে মুক্ত হয়ে শিবত্ব লাভ করো। সেই ত তোমার সত্যিকারের স্বাধীনতা, প্রকৃত স্বরাজ।"

বস্তুতঃ অধীনতাই জীবত্ব আর স্বাধীনতাই শিবত্ব বা ঈশ্বরত্ব। মায়ামোহের অধীন হয়ে পরিচালিত হওয়া জীবত্ব, আর মায়ামোহ হতে মুক্ত অবস্থাই ঈশ্বরত্ব। যখন মানব কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ

ইত্যাদির অধীন হয়ে, তাদের ইঙ্গিতে পরিচালিত হয়ে, ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে, ইন্দ্রিয় সেবাতে আত্মনিয়োগ করে, তখন সে জীব; আর যখন ইন্দ্রিয় ও তদীয় বৃত্তিগুলিকে বশীভূত করে মানব জিতেন্দ্রিয় হয় অর্থাৎ যখন ঐ সকল বৃত্তি তার অধীন ও আজ্ঞাধীন হ'য়ে পরিচালিত হয়, তখন সে ঈশ্বরতুল্য বা ঈশ্বর। এক কথায় শক্তির বশীভূত থাকাই জীবত্ব, আর শক্তিকে স্ববশে আনা ও তদ্দ্বারা ইচ্ছামত কার্য ক'রে নেওয়াই ঈশ্বরত্ব। শাস্ত্রকারও বলেছেন—

"পাশবদ্ধো ভবেজ্জীব, পাশমুক্ত সদাশিবঃ।"

অর্থাৎ পাশবদ্ধ হলেই জীব, আর পাশবিমুক্ত হলেই শিব। ঘৃণা, শঙ্কা, ভয়, লজ্জা, জগুপ্সা (নিন্দা) কুল, শীল ও মান—এই আটটি জীবের বন্ধনের কারণ, এজন্য শাস্ত্রে এরা পাশ বা বন্ধনরজ্জুরূপে কীর্তিত হয়েছে। যিনি এই অষ্ট পাশ হতে মুক্ত হয়েছেন তিনি সদাশিব বা ঈশ্বরতুল্য। পাশবদ্ধ জীবের দুঃখে আক্ষেপ করে বিমুক্ত সাধক গেয়েছেন—

"চিদানন্দ স্বরূপে যার নিত্যশুদ্ধ নিরঞ্জন
বিন্দুনাদ কলাতীত সাক্ষীভূত সনাতন।"
সে কিনা আজ মায়ার ফেরে পাশবদ্ধ কারাগারে,
অনিত্য বাসনা লয়ে মায়ার খেলা খেলিছে রে।"

ভগবান ও জীব পরমাত্মা এবং আত্মা স্বরূপতঃ এক। জীবভাব পরিত্যাগ হলেই জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন হয়। জীব যতদিন তার এই সত্য স্বরূপে অবস্থান করবে অর্থাৎ যতদিন তার সচ্চিদানন্দরূপ ঈশ্বরত্ব লাভ না হবে, ততদিন পর্যন্ত কিছুতেই পূর্ণ শান্তি বা পূর্ণ আনন্দের অধিকারী সে হতে পারবে না। জীবজগৎ রহস্য অবগত হ'য়ে "নেতি" "নেতি" সত্তার "নেতি বিচার দ্বারা জীব ত্যাগ করে

চৈতন্যময় ব্রহ্মসত্তার সহিত সতত নিদিধ্যান করলেই ব্রহ্মত্ব লাভ সুনিশ্চিত; এবং তাতেই জীবের পরা শান্তি। নইলে মোহমুগ্ধ অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন জীব যতই নিজের ক্ষুদ্রতার মধ্যে ঘুরতে থাকবে ততই তার দুঃখ দুর্গতি। জীবের দুঃখে ব্যথাভারাতুর হৃদয়ে সাধক গেয়েছেন—

"প্রকৃতির দ্রষ্টা হ'য়েও ভুলে রইলে বিকারেতে
রূপ রসাদির ধাঁধাঁয় পড়ে, হাস, কান্দ সুখ দুঃখেতে।
সুপ্ত সিংহ তোমরা সবে, ভুলে কেন রয়েছ রে,
অমৃতের সন্তান হ'য়ে, হেন দশা সাজে কিরে।

বস্তুতঃ জীবের যদি একবার এই জ্ঞান আসে যে সে অমৃতের সন্তান, কাজেই অস্ত্রে তাকে ছিন্ন করতে পারে না, অগ্নি তাকে দগ্ধ করতে পারে না, সে অজেয় অমর তবে কি আর তার দুঃখ কষ্ট থাকতে পারে?"

শত্রু যদি তাকে হত্যাও করে তবু সে জানে আমি ত আমার দেহ নই—দেহের বিনাশে ত "আমি" বিনষ্ট হই নাই। আমি ত আমার অজর অমর আত্মা। এই আত্মার দর্শন যিনি পেয়েছেন তিনি জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ—সাংসারিক দুঃখ দৈন্য তাকে বিচলিত করতে পারে না। ওগো ভারতবাসী, ভারতের আর্য্য ঋষিগণ একদিন তোমাদিগকে প্রেমামৃত প্রদানে অমর করবার জন্য সস্নেহে সাদর আহ্বানে মধুর কণ্ঠে বিজয় নিনাদে বলেছিলেন—

শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।

হে বিশ্ববাসী অমৃতের পুত্রগণ তোমরা শ্রবণ করো। যদি জ্ঞানামৃত পানে জরা মরণের হাত হতে অব্যাহতি পেয়ে অমর হ'তে চাও, তবে জ্ঞানময় সর্বগুণাকর, সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী, সর্বত্র পরিপূর্ণ, অখণ্ড

চিন্ময় ভগবৎ সত্তায় চিরতরে ডুবে যাও। ব্রহ্মানন্দ রস পান করে অমরত্ব লাভ করো। "নান্যপন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়।" হে জীব, এ ভিন্ন যে আর তোমার গতি মুক্তি নাই। মনে পড়ে প্রাচীন ভারতের আর্য্য ঋষিগণের কথা। তারাও একদিন জগতের দুঃখ দৈন্য দারিদ্র্যের হাত হ'তে অব্যাহতি পাবার জন্য সকলে সমবেত হ'য়ে মুক্তির পথ খুঁজছিল। এ দুর্গম সংসার অরণ্যের মধ্যে মুক্তির পথ কৈ—এই প্রশ্নে দিশেহারা হ'য়ে তারা যখন স্তম্ভিত হ'য়ে বলেছিল তখন ষোড়শ বর্ষীয় ঋষি বালক দাঁড়ায়ে জলদ গম্ভীর নিনাদে দৃপ্ত কণ্ঠে বলেছিল—

শোন বিশ্বজন!
শোন অমৃতের পুত্র যত দেবগণ,
দিব্যধামবাসী আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্তপুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ম্ময়, তারে জেনে তার পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পারো, অন্য পথ নাহি।

আজ ভগবান ব্রজানন্দ স্বামী ও ভারতের সেই ভুলে যাওয়া অন্তর্নিহিত মহাবাণীকেই জাগ্রত ক'রে তুলছেন। ওগো মোহবদ্ধ জীব, ছুটে এসে আশ্রয় মাগ তাঁর ঐ অতুল রাতুল চরণ তলে। এই ত তোমার একমাত্র পথ। এই আদর্শে যদি তুমি আজ আত্মোপলব্ধি করতে না পার তবে মিথ্যা তোমার রাজনৈতিক স্বরাজ সাধনা, মিথ্যা তোমার সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টা, মিথ্যা তোমার বড় হবার নিষ্ফল আকাঙ্ক্ষা। আগে নিজের, নিজ জীবনের, নিজ আত্মার স্বরাজ লাভ করো। বিশ্বের স্বরাজ এসে হাজির হবে তোমারি দুয়ারে। নইলে বৃথা তোমার আস্ফালন। কবি সত্যই ত বলেছেন—

"রে মৃত ভারত,
শুধু এই এক আছে, নাহি অন্য পথ,"

হে মায়ামুগ্ধ জীব, আবার বলছি যদি ব্রহ্মানন্দ রসপানে জরা-মরণের হাত হতে অব্যাহতি পেয়ে অমরত্ব লাভ করতে চাও তবে ছুটে এস, আশ্রয় মাগ ঐ নব যুগের নব অবতার ব্রজানন্দ স্বামীর শাশ্বত অভয় বাণী—"শিবোহম্" "শিবোহম্" ধ্বনির তলে।

যদি প্রেম চাও, তবে ভক্ত রঞ্জন, পতিতপাবন প্রেমময়, মদন-মোহন শ্রীভগবান ব্রজানন্দ স্বামীর শ্রীচরণ-সরোজে সম্পূর্ণরূপে আত্মবলি দান করো। যদি রূপের অভিলাষ করে থাকো তবে সর্ব রূপাধার, করুণা পারাবার শ্রীভগবান নূতন যুগের অবতার ব্রজানন্দ স্বামীর অনন্তরূপ মাধুর্য্য পরিপূর্ণ রূপ দর্শন করে আত্মহারা হও। আর যদি রস বা আনন্দ পেতে চাও তবে সর্ব রসানন্দের আধার পূর্ণতম রসবিগ্রহ স্বামীজীর অনন্তলীলা রস মাধুর্য্য আস্বাদন ক'রে প্রেমামৃত রসার্ণবে অনন্তকালের জন্য ডুবে অনন্ত মিলনে মিলিত হও আর প্রেম কারুণ্য কণ্ঠে বলো—

"ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিনং ত্বমেব, ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব॥

হে দেবাদিদেব তুমিই আমার মাতা, তুমিই আমার পিতা, তুমিই আমার বন্ধু, তুমিই আমার সখা, তুমিই আমার ধন—তুমি আমার সর্বস্ব।

———

৮। নাম মাহাত্ম্য

আয়রে সকলে মন প্রাণ খুলে ব্রজানন্দ বলে নাচি গাই।
ওরে মধুমাখা এ মধুর নাম কে নিবি তোরা আয়রে ভাই।
নব গায়ত্রী এ নাম কলিতে, যতই বলিবে মধুর বলিতে,
দুস্তর ভব জলধি তরিতে এ নাম ছাড়া আর গতি নাই।
ব্রজানন্দ নাম বড় যাদুকরী, বলিতে বলিতে চোখে আসে বারি।
কি দিব তুলনা বল না তাহারি, ব্রজানন্দ মোর ব্রজের কানাই।
অধম পতিত পাপীর লাগিয়া, গোলোকের নাথ গোলোক ছাড়িয়া,
কাঙ্গাল হয়েছে কৌপীন পরিয়া, এমন প্রেমের তুলনা নাই।
এ নামে গোবিন্দ আপন হারা, ত্যজিয়া সকলি হ'ল গৃহ ছাড়া,
জটিয়া বাবাজি প্রেমে মাতোয়ারা, এ নাম রসে মজিয়া সদাই।
ছিল মুসলমান আলমাস আলি, দুই বাহু তুলি শিব শিব বলি।
এ নামে মাতিয়া হল উতরলি, এ যে সেই হরিদাস গোঁসাই।
শিষ্য সে বিদুর আর যুধিষ্ঠির, জ্ঞানদা, অন্নদা সহিত অধীর।
ব্রজানন্দ পদে লোটায়ে শির, কেঁদে কহে যেন চরণ পাই।
এ নামে ঘুচায় কুলমান, জ্বালা, কুলের কামিনী আশাকুল বালা,
হ'য়ে বিরাগিনী নামেতে উতলা, রাজীব চরণে নিয়েছে ঠাঁই।
এ মধুর নামে শ্যামলা উদাসী, প্রভা পাগলিনী নাম ভালবাসি,
আমি শুধু চাই নাম রসে ভাসি, নাম নিয়ে যেন মরিতে পাই।

———

১। সাধন পথ

পূর্বে "নবযুগের অবতার ভগবান ব্রজানন্দ স্বামীর বাণীর" মধ্যে যে ব্রহ্মভাব বা জ্ঞানযোগের কথা বলা হয়েছে—তার সঙ্গে ভক্তি বা জ্ঞানযোগের মূলতঃ কোনই বিরোধ নাই। বর্তমান প্রবন্ধে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করে দেখাতে চাই, কেমন করে এই তিনটি আপাতঃ বিভিন্ন সাধন পথের আদর্শ ভগবান ব্রজানন্দ স্বামীর মধ্যে সমন্বয়লাভ করেছে। এমন আর পূর্বের কোন অবতারের মধ্যে সম্পূর্ণ সমন্বয় পরিদৃষ্ট হয় না ব'লেই স্বামিজীকে আমরা পূর্ণ অবতার বলতে চাই।

বস্তুতঃ কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ—এই যে তিনটি যোগের কথা আমরা শাস্ত্রে দেখতে পাই ইহারা মূলতঃ একই আদর্শে পৌঁছিবার একই পথের বিভিন্ন অংশ মাত্র। আগা, মধ্য ও গোড়া। যোগী, জ্ঞানী ও ভক্ত—তিনজনেই ভগবানকে পেতে চান; সকলেরই এক আদর্শ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা। যোগী যিনি তিনি খুঁজে ফিরেন আপন আত্মতত্ত্ব যোগ, প্রাণায়াম, ন্যাস, কুম্ভক প্রভৃতি নানাপ্রকার কৃচ্ছ্র সাধন দ্বারা। এই ভাবে যখন তিনি আত্মতত্ত্ব লাভে সমর্থ হন, তখন স্বতঃই তার অন্তরের অন্তশ্চক্ষু উন্মিলিত হয়, তিনি পরমাত্ম তত্ত্বেরও সন্ধান পান। তখন সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞান বা Intuition দ্বারা তিনি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় এক ব্রহ্মের একই শাশ্বত সত্তা উপলব্ধি করতে পারেন। এই দ্বিতীয় স্তরের নামই জ্ঞানযোগ। কর্মযোগী কর্ম অভ্যাস করতে করতেই জ্ঞানযোগী হন। ৺শঙ্করাচার্য বেদান্তের প্রথম সূত্র "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" টীকা লিখতে গিয়ে এই কথাটাই বিশেষ ক'রে বুঝিয়েছেন। সূত্রটির সাধারণ বাংলা অর্থ

হচ্ছে—এর পর হতে ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলা হচ্ছে। এই লিখতে গিয়ে গ্রন্থকার কেন প্রথমেই বললেন—এর পর হ'তে। তাহলে ইহা সহজেই অনুমান হয় যে, এর পূর্বেও কিছু ছিল। পূর্বের তাহা কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া শঙ্করাচার্য্য বহুতত্ত্ব আলোচনা ক'রে দেখিয়েছেন যে, ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী তিনি, যিনি যোগশাস্ত্র অনুযায়ী বিবিধ কর্মানুষ্ঠান করিয়াছেন। অবশ্য সেই সকল জটিল তত্ত্ব-সকল সম্বন্ধে কোন কিছু বলা সম্ভব নহে। মোটামুটিভাবে শাস্ত্র পড়িলে প্রত্যেকেরই এই ধারণা জন্মিবে যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ কতকগুলি বিধি অনুযায়ী কর্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

তারপরে ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইলে সাধক ভক্তিতে আত্মহারা হন;—ইহাই সাধনার চরম পরিণতি। তখন ভগবানের নাম নিতে অথবা তাঁরই স্মরণ মাত্রেই তিনি আত্মবিস্মৃত হ'য়ে ভাব সমাধি লাভ করেন। এই ভাবে সমাধি লাভই ব্রহ্মত্ব লাভ। এই অবস্থায় ভক্তের দ্বৈতভাব ঘুচে যায় তিনি উপলব্ধি করেন যে সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডময় তিনিই রয়েছেন। জরা, মরণ, ব্যাধির অধিকারের বহু ঊর্ধ্বে প্রেমে আত্মহারা হয়ে তিনি শুধু আপনার ভাবে আপনি বিভোর হয়ে নাচতে থাকেন। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হ'লেই সাধকের পরাভক্তি উদয় হয়।

ব্রজানন্দ স্বামীর জীবনী আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই এই তিনটি সাধনপথের সমন্বয় লাভ করেছে তাঁরা জীবনে। তিনি একাধারে যোগী, জ্ঞানী ও ভক্ত। পূর্বের কোন অবতারের মধ্যেই এই সর্বসমন্বয় পরিলক্ষিত হয় না। প্রথম জীবনে বহু কালাবধি তিনি নির্জনে গভীর গহনে যোগ তপ ক'রে কাটিয়েছেন। সেই প্রথম

জীবন ছিল তাঁর কর্মযোগময় জীবন। তারপরে তিনি যে মহাজ্ঞানী জ্ঞানযোগী—এ কথা পূর্বের প্রবন্ধে তাঁহার বাণীর মধ্যে বলা হ'য়েছে।

বর্তমান প্রবন্ধে দেখাতে চাই—তিনি সাধনার পথ জগৎকে যা নির্দ্দেশ করেছেন তাহা শুধু কর্ম ও জ্ঞান নিয়ে নয়, ভক্তিকেও তিনি বাদ দেন নাই। নিজে তিনি মহাভক্ত, এবং জগৎকেও ভক্তির মহাবার্তা শুনিয়েছেন।

ব্রজানন্দ স্বামী কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ে এই যে নূতন ধর্ম জগৎকে দিতেছেন ইহা বাস্তবিকই অতি অভিনব। হিন্দুশাস্ত্র যাঁরা খুব মনোযোগ সহকারে আলোচনা করেছেন তাঁরা জানেন—অতি আদি—বেদের যুগে হিন্দুদের ধর্ম কর্মযোগ প্রধান ছিল। সেদিনকার লোকে ক্রিয়াকর্ম, যাগ-যজ্ঞাদি করাটাকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম মনে করত। সেদিনকার শাস্ত্রে কত নরমেধ, গোমেধ, অশ্বমেধ, রাজসূয় প্রভৃতি যজ্ঞের কথা আমরা পড়তে পাই। কিছুকাল পরে উপনিষদের যুগে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পাই মানুষের মতি পরিবর্তন হ'ল। তারা বুঝতে পারল—মিথ্যা এই যাগ-যজ্ঞ—এতে শুধু বড় মানুষী প্রচার করা। আপনারা সকলেই জানেন—অশ্বমেধ রাজসূয় প্রভৃতি যজ্ঞের অর্থ কি। কোন রাজা অন্যান্য রাজাদের নিকট তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করতে তখন সে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে সৈন্য-সামন্তসহ একটা ঘোড়া ছেড়ে দিল; যে রাজা সে ঘোড়া বাঁধবে তাকে পরাজিত ক'রে ঘোড়া কেড়ে এনে প্রমাণিত করে দিল—সে সকলের চেয়ে বড় রাজা। রাজসূয় যজ্ঞেরও ঐ একই অর্থ। এর মধ্যে ধর্মের স্থান কোথায়! বিশেষতঃ যাগ-যজ্ঞাদিতে যে অসংখ্য নরবলি হ'ত তা দেখে ক্রমে ক্রমে মানুষের মনে ধিক্কার জন্মাতে লাগল—সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা অনন্ত করুণাময় ভগবানের পূজা

কখনও তাঁরি সৃষ্ট জীবকে হত্যা করে হতে পারে? তাতে তিনি নিশ্চয়ই সুখী হন না। সেই পশুকেও কি তিনি সৃষ্টি করেন নাই? বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের সাথে সাথে তাই উপনিষদের যুগে লোকে ঐ সকল যাগ-যজ্ঞাদি পরিত্যাগ করে জ্ঞানের আলোচনা করতে লাগল। সেদিন ভারতবর্ষে যাজ্ঞবল্ক্য, কপিল, কণাদ, চার্বাক, ব্যাস, জাবালী প্রভৃতি মহা মহা ঋষিগণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন,—তাঁদের কাছ থেকে আমরা ষড়দর্শন, উপনিষদ, বেদান্ত প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থসকল পেয়েছি। শ্যামজলদবপু লীলা রসময় শ্রীকৃষ্ণও সেদিন অবতীর্ণ হ'য়ে জ্ঞানপিপাসু ভারতবাসীর উত্তপ্ত হৃদয়কে গীতার শান্তি সুধায় প্লাবিত করে দিলেন। ভারতের সেদিনকার ধর্ম ছিল –জ্ঞানযোগ প্রধান।

জ্ঞানের আলোচনায় কিছুদিন পর্য্যন্ত এদেশবাসীর মন ও মস্তিষ্কের তৃপ্তি হ'ল সত্য; কিন্তু মন ও মস্তিষ্কই ত মানুষের সব নয়। তার হৃদয় ব'লে আরো একটা জিনিষ আছে, সেই হৃদয়ের তৃপ্তি ত কৈ জ্ঞানে হ'ল না। বস্তুতঃ কেবলমাত্র জ্ঞানে মানব হৃদয়ের প্রকৃত শান্তি কৈ? যত জানি ততই ত জানবার জিনিসের অভাব নাই। বরং যত জানি ততই ত কেবলি মনে হয় –কিছুই ত জানা হ'ল না!

বস্তুতঃ কেবলমাত্র জ্ঞানেই মানুষের হৃদয় পুরা শান্তি লাভ হ'তে পারে না। ভারতবাসীও সেদিন জ্ঞানের দ্বারা তাদের শান্তি খুঁজে পাচ্ছিল না,—একটা প্রশ্নের যদি উত্তর মেলে, আরো হাজার প্রশ্ন ক্রমে উদয় হয়। এদেশবাসী যখন সেদিন জ্ঞানের চর্চা ক'রে ক্রমেই উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে পড়ছিল তখন প্রেম-ভক্তির অবতার গৌরাঙ্গদেব অবতীর্ণ হলেন নদীয়ায়। ভক্তির গান গেয়ে গেয়ে তিনি উন্মাদ। ভারতের পল্লীতে পল্লীতে ভক্তির মাহাত্ম্য গান গেয়ে নেচে নেচে ফিরতে লাগলেন তিনি। তিনি বললেন—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।"

হরিনাম ছাড়া জীবের আর গতি মুক্তি নাই—জ্ঞান, কর্ম সবই মিথ্যা,—জীবে প্রেম, নামে রুচি ইহাই একমাত্র ধর্ম। কিন্তু গৌরাঙ্গ দেব শুধু প্রেমভক্তির ধর্ম দিতে গিয়ে যে জ্ঞান ও কর্মকে একরূপ বাদ দিলেন ইহাতেই বোধ হয় তাঁহার প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম এদেশে বেশীদিন স্থায়ী হ'তে পারল না। কেননা কর্মদ্বারা সাধকের মন দৃঢ় না হলে তাহার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হতে পারে? পূর্বে বেদান্তের প্রথম সূত্র "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা"র শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্যের উদাহরণ দ্বারা একথা বুঝবার চেষ্টা করেছি। আবার ব্রহ্মজ্ঞান না জন্মিলে সাধকের মনে সত্য সত্য ভক্তির উদয় হয় না একথা পূর্বেই বলেছি সুতরাং গৌরাঙ্গদেবের ও শুধু ভক্তির ঐ একদেশী বৈষ্ণব ধর্মেও মানব প্রাণের পুরা শান্তি লাভ হ'ল না। তাই বুঝি আবার অবতারের প্রয়োজন হয়েছে। এবার তাই অনন্তপ্রেমের সিন্ধু ব্রজানন্দ চাঁদ অবতীর্ণ। একাধারে যোগী, জ্ঞানী, ভক্ত ও সন্ন্যাসীরূপে প্রেমের বন্যায় দেশকে ভাসিয়ে দিতে চান। ব্রজানন্দস্বামী পূর্ণ অবতার,—তিনি একাধারে শ্রীকৃষ্ণ, বলাই, গৌরাঙ্গ, নিতাই, রাধিকা ও বিষ্ণুপ্রিয়া। এবার পূর্ণ অবতার ব্রজানন্দ চাঁদ অবতীর্ণ হ'য়ে প্রেমের বন্যায় দেশকে ভাসিয়ে দিচ্ছেন। যুগ যুগান্তের প্রেম পিপাসাকুল ভক্তগণ এবার তাঁহার অনন্তপ্রেম জলধি হ'তে গণ্ডূষ ভ'রে সুধা পান করে জন্ম জন্মের সঞ্চিত আকণ্ঠ পিপাসার নিবৃত্তি করছে। অন্যভাবে আমরা যদি ভগবানের সকল অবতারগুলি পর পর আলোচনা ক'রে দেখি তাহ'লেও সহজেই বুঝতে পারব এই অবতারই সর্বাপেক্ষা পূর্ণতম। অবতারগুলির মধ্যে আমরা বেশ পরস্পর ক্রমোন্নতি বুঝতে পারি। প্রথমতঃ মীন অবতার

—সৃষ্টির অতি আদি ক্ষুদ্রতম প্রকাশ। তৎপর কুর্ম অবতার। মীন অপেক্ষ কুর্ম সৃষ্টির আরো একস্তর উন্নত। তৎপরে বরাহ অবতার মীন কুর্ম অপেক্ষা আরও উন্নততর বিকাশ। বরাহের পরে—নৃসিংহ অবতারে অর্ধেক মনুষ্য ও অর্ধেক পশুশরীর সৃষ্টির অধিকতর উন্নতিকেই সূচিত করে।

বামন অবতারে ছোটখাটো একটি মানুষ এবং তার পরের অবতারে অসভ্য কুঠারধারী পুরুষ পরশুরাম সৃষ্টির আরও উন্নততর বিকাশ। তারপরের অবতার শ্রীরামচন্দ্র সুসভ্য ন্যায়বান আদর্শ নৃপতি। তৎপরে জ্ঞান ও প্রেমের অবতার শ্রীকৃষ্ণ শুধু আদর্শ নৃপতি নন, বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞানের গরিমায় তিনি জগতের আদর্শ। তৎপরে আরো পূর্ণতররূপে অবতীর্ণ হ'লেন দয়ার অবতার ভগবান বুদ্ধদেব। জগতের দুঃখ, দৈন্য, দারিদ্র্য দেখে রাজপুত্র বুদ্ধ জীর্ণ কন্থা পরিধান ক'রে সংসার বিরাগী সন্ন্যাসী হ'লেন। বুদ্ধদেবের পরে আসিলেন আরও পূর্ণতর রূপে প্রেমভক্তির অবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীগৌরাঙ্গদেব। প্রেমভক্তির আকুল বন্যায় সমগ্র ভারতবর্ষকে তিনি প্লাবিত ক'রে দিলেন।

ইহাদের সকলের পরে পূর্ণতম রূপে এবার অবতীর্ণ হয়েছেন ভগবান ব্রজানন্দ চাঁদ। তিনি একাধারে জ্ঞান, ধর্ম, প্রেম, ভক্তি, মানবের মহত্তম সমস্ত আদর্শ নিয়ে এসেছেন। গৌরাঙ্গলীলা অবসানের কালে গৌরাঙ্গদেব ভক্তগণের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতি পালন করবার জন্যই এবার তিনি পরিপূর্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁহার করুণা সমস্ত জগৎকে অভিসিঞ্চিত করুক—এই শুভ কামনা নিয়ে প্রবন্ধ শেষ করি।

—:০:—

১০। প্রণামঃ (ভজন)

নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমোনমঃ

অনন্ত গুণ নিধান ব্রজানন্দ গুণধাম।
পরম শান্তি নিলয় অত্যদ্ভুত জ্যোতির্ম্ময়,
শ্যামল পীত কলেবর রসময় মনোরম।
মহত্তম জ্ঞান নিধে প্রেমদাতঃ পিতর্বিধে,
গুণানান্ত মহোদধে রক্ষ রক্ষ প্রাণারাম।
সর্বাংস্তয়ি ভক্তান্ সতঃ, পালয়ত্বং জগতপিতঃ,
শক্তি হীনান্ স্বশক্তিতঃ ত্বং হি দেব পূর্ণং প্রেম।
পাতকীনাম ভবভার অপনোদনায় অবতার
ত্বং হি প্রেম পারাবার শান্তোজ্জ্বল কান্তি কম
দেবীনাং বা দেবানাং বা শক্তি নারানামথবা,
তপস্বিনাং গুণিনাং বা তজ্জাতা মাহসত্তমঃ।

ওঁ ব্রজানন্দ ওঁ
ডাক এসেছে ব্রজানন্দের
শোনরে পেতে কান।
যে যেখানে আছে ধরায়
মানব-সন্তান।
হিংসা দ্বেষ বিভেদ ভুলে
আয় না সবে দলে দলে
মহাপ্রেমের ঝাণ্ডাতলে
মিলবি প্রাণে প্রাণ।

হোক্ না পীত সাদা কালো
সবাই মানুষ, ভাই;
সবার চেয়ে মানুষ বড়
তার যে বাড়া নাই।
দেখ না তুই নয়ন মেলে
বিশাল এই ধরাতলে
ঘরে ঘরে বিরাজিছে
মানুষ ভগবান।

ওঁ ব্রজানন্দ ওঁ
ব্রজানন্দ মহাকালী—
দেখরে প্রাণের প্রদীপ জ্বালি।
তার করুণার অমল আলো
দূর করে যে নিখিল কালো
ভক্তিহৃদি মন্দিরে তাই,
নিত্যচলে তাঁর দেয়ালি।

তিনি কখন শ্যামা, কখন শ্যাম,
ব্রজানন্দ, শিব, রায়,
গৌরহরি, নারায়ণ,
গড্, খোদা ও গৌতম।
ভক্তিরূপ কারণ পিয়ে
কাম বাসনা রুধির দিয়ে
অনুরাগের রক্তজবায়।
দে সাজিয়ে পূজার ডালি

—:০:—